দৈনিক

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন স্বায়ত্তশাসন গুরুত্বপূর্ণ

মুহাম্মদ দিদার

'বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দ দুটি একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেন দুটি শব্দকে আলাদা করা যাবে না? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে তাকাতে হবে। প্রশ্ন ওঠে—বিশ্ববিদ্যালয় কি শুধু উচ্চতর গবেষণা ও সত্যানুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে? নাকি ছাত্রদের শিক্ষিত করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা হবে? বেশিরভাগ মনীষী গবেষণা ও সত্যানুসন্ধানের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁরা আরেকটি বিষয়ের কথা বলেছেন; সেটি হচ্ছে—শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মননশীলতা বৃদ্ধি ও সংস্কৃতির বিস্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নিরেট স্বৈরতন্ত্র আর ভেজাল গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বদা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যখন সত্যের কাণ্ডারি হবে তখন এইসব রাষ্ট্রের শাসন কখনো বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নেবে না। আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, ১৯৫২-তে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্যায়কে মেনে নেয়নি, ১৯৭১-এ মেনে নেয়নি, ১৯৯০-তে স্বৈরশাসককে মেনে নেয়নি। এর মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় যদি ক্ষমতাশীন শাসকের অধীনস্থ হয় তবে নিশ্চিতভাবে সত্যানুসন্ধানে পিছপা হয়ে যাবে, বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।

যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ জানতে হলে সেই সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। গির্জাশাসিত সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে যখন গির্জার পোপরা ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হস্তগত করতে থাকে, ঠিক সেই সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সৃষ্টি হতে থাকে। অক্সফোর্ড (১১৬৭), কেমব্রিজ (১২৩৯), নেপলস (১২২৪) ইত্যাদি।

অক্সফোর্ড প্রথম থেকেই বাইরের হস্তক্ষেপ নিয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিল। তারা একটি নিজস্ব চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করে, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এই চরিত্র রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। রাষ্ট্রীয় কোনো হস্তক্ষেপ করতে এলে তারা কঠোরভাবে প্রতিবাদ করত, এমনকী মারামারি পর্যন্ত লেগেছিল। শহর ছেড়ে নির্জন কোনো স্থানে গিয়ে শিক্ষায়তন স্থাপনের হুমকিও দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীকালে রাজা তৃতীয় হেনরি (১২১৬-১২৭২) তাঁর রাজ্য পরিচালনা কর্মপর্ষদকে সরাসরি নির্দেশ দেন, যাতে করে কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করা হয়।

রাজা প্রথম জেমসের সময়ে (১৬০৩-১৬২৫) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয় সংসদে দুইজন প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সনদ লাভের জন্য চার্চের আনুগত্য স্বীকার করতে হতো। ১৬৮৭ সালে রাজা দ্বিতীয় জেমস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানরূপে একজন রোমান ক্যাথলিককে নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন, শিক্ষকরা এই চাপকে অগ্রাহ্য করলে রাজা নিজেই অক্সফোর্ডে উপস্থিত হয়ে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষককে বহিষ্কার করেন। তবে রাজা শিক্ষকদের স্বাধীনতাবোধ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

এটা তো প্রথম দিকের কথা। ১৯০৪ সালে হলডেন কমিটি মন্তব্য করেন—বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া রাষ্ট্রীয় অর্থ বণ্টনের একটি কমিটি থাকা উচিত। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি নাকচ করে দেয়। এমনকী পরবর্তী সময়ে ওই পরিষদ এই নীতি চালু করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া রাষ্ট্রীয় অর্থের ৯০ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় নিজের ইচ্ছায় ব্যয় করবে আর ১০ভাগ একটি স্থায়ী কমিটি নির্ধারণ করে দেবে টাকাটা কোথায় ব্যয় করা হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এটাকে হস্তক্ষেপের শামিল মনে করে। এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো অর্থই হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে সব সময় আমরা দেখব তারা কখনো রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জানত যদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বকীয়তা হারাবে। কোনো আদর্শ, বর্ণ, জাতীয়তা, মতবাদের উর্ধ্বে থেকে সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে যেতে হবে। যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সবচেয়ে বেশি জরুরি। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকলে রাষ্ট্র সর্বদা চাইবে নিজেদের মদতপুষ্ট কিছু মানুষ তৈরি করতে, যারা রাষ্ট্রের অন্যায়কে মেনে নেবে। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়